জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-৮, নং-১, জানুয়ারি-জুন ২০১৮

মধুসূদনের ইংরেজি প্রবন্ধ : নারী ও সমাজভাবনা

ফেরদৌসী খাতুন*

Abstract

Michael Madhusudan Datta (1824 –1873) is the first great poet as well as superb dramatist of modern Bengali literature of 19th century. He is considered as the father of Bangla sonnet. He is also considered a leading figure of the Bengal Renaissance of the mid–nineteenth century. His early compositions were in English. He wrote three essays in English based on development of women and society. In this article, there is an attempt towards community-seeking solution. He emphasized on the rights of woman as pre-condition in the development of society. In his write-ups, he shew a sharp, romantic, liberal mind, above the narrow prejudices that were common among his contemporaries. Even he used Muslim source in his writings that were not thought by any other Bengali writer. In overall sense, his thinking was in advance and progressive from the era. There is also an attempt to focus on women and society development thinking of Datta's English articles.

ভূমিকা

বঙ্গীয় রেনেসাঁ যখন ধর্মীয় কুসংস্কার, জড়তা ও নানামুখী অন্ধকার প্রবণতা থেকে মানুষকে মুক্ত করে সমাজ সংস্কারে উদ্বুদ্ধ করে, বাংলা সনেট ও আধুনিক বাংলা নাটকের জনক মাইকেল মধুসূদন (১৮২৪–১৮৭৩) সেই রেনেসাঁর প্রাণপুরুষ। যুগপ্রেক্ষিত ও পটভূমি কীভাবে মধুসূদনকে প্রভাবিত করেছিল, তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ তাঁর রচনাবলিতে ছড়িয়ে আছে। উনিশ শতকের বাংলা ছিল সমাজ-সংস্কার, ধর্মীয় দর্শনচিন্তা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, দেশপ্রেম ও বিজ্ঞানের পথিকৃৎদের এক অনন্য যুথবদ্ধতা যা মধ্যযুগের অন্ত ঘটিয়ে এ-দেশে আধুনিক যুগের সূচনা করে। এই পথিকৃৎদের মধ্যে অন্যতম অগ্রগামী হলেন মধুসূদন। বাংলা সাহিত্যে তিনি ধারা পরিবর্তনের প্রবর্তক। পুরোনো আমলের জঙ্গমতা অতিক্রম করে আধুনিক সভ্যতার আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে সাহিত্যের দিশারি হয়েছেন তিনি। তাঁর কৃতিত্ব এই যে, তিনি যা কিছু রচনা করেছেন তাতেই নতুনত্ব এনেছেন। তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শ বাংলাসাহিত্যে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন। সমাজ পরিবর্তন–ভাবনা তাকে নাড়া দেয়। এই ভাবনাকে তিনি তুলে ধরেন সাহিত্যের অবলম্বনে। সেই চিন্তা থেকে তিনি বাঙালি সমাজের অধঃগতি ও এর থেকে পরিত্রাণের উপায় তুলে ধরেন তিনটি ইংরেজি প্রবন্ধে। প্রবন্ধসমূহে সমাজের অগ্রগতির জন্য তিনি প্রচলিত মানসিকতার পরিবর্তনের তাগিদ দিয়েছেন, এমনকি নিজে স্বয়ং প্রতিবাদ করেছেন। সমাজের স্বার্থে তিনি নারীর উন্নয়নের কথা বলেছেন। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই সুদূর প্রসারী চিন্তা তাকে এনে দিয়েছে স্বতন্ত্র সত্তা ও উজ্জ্বল মহিমা।

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমাজের বিদ্যমান সমস্যাকে চিহ্নিত করে তা থেকে পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ মধুসূদন যে সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেন তিনটি ইংরেজি প্রবন্ধে, তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজ ও নারী বিষয়ে তাঁর চিন্তার মৌলিকত্ব তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দিষ্ট।

গবেষণার যৌক্তিকতা

মধুসূদনের সমগ্র সাহিত্যের বিবেচনায় এ-কথা বলা যায় যে, তাঁর সনেট ও নাটক নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে, গবেষণা হয়েছে, তাঁর প্রবন্ধ নিয়ে ঠিক ততটাই কম আলোচনা হয়েছে, যদিও এসব প্রবন্ধে তিনি মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। পিতার আরোপিত আদেশ তিনি যেমন মানেননি, তেমনি সমাজে নারীকে অধিকারহীন করে রাখার বিরোধিতা করেছেন। সমাজের এই অনগ্রসরতার চক্রে আবর্তন থেকে বের হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন তিনি, যা সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ নতুন ও বৈপ্লাবিক। কিন্তু এ বিষয়ে তেমন গবেষণা হয়নি। তাই তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধ নিয়ে গবেষণার যৌক্তিকতা অপরিহার্য।

গবেষণার গুরুত্ব

মধুসূদন যে সময়ে সমাজউন্নয়ন নিয়ে ভেবেছেন, সে সময়ে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণার্থে কেউ এভাবে ভাবতে অভ্যস্ত ছিল না। সমাজব্যবস্থাই ছিল অনেকটা ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থকেন্দ্রিক। সে যুগে নারীকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো না, নারীর অধিকার কিংবা স্বাধীনতা তো অনেক পরের ব্যাপার। নারীর ভূমিকা ও উন্নয়ন ব্যতীত সমাজের পরিবর্তন ও উন্নয়ন অসম্ভব সত্ত্বেও সেকালে নারীর কোনরকম গুরুত্ব ছিলনা, পারিবারিক কিংবা সামাজিক কোনোক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের সুযোগ ছিল না। পুরুষতান্ত্রিক বাঙালি সমাজ তা কখনও ভাবতেও পারেনি। মাইকেল মধুসূদন প্রথম সমাজ-সংসারে নারীর ভূমিকা পালনে সুযোগদানের আহ্বান জানান। এই প্রবন্ধে মাইকেলের প্রাগ্রসর সমাজচেতনাকে তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা পাঠককে তৎকালীন সমাজবাস্তবতা অনুধাবনে এবং নারী ও সমাজোন্নয়নে মধুসূদনের ভূমিকা জানতে সহায়ক হবে। এ সূত্রে প্রবন্ধের গুরুত্ব অপরিসীম।

গবেষণা পদ্ধতি

এটি মূলত একটি পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের গবেষণায় বিশ্লেষণ ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণার মৌলিক উৎস মাইকেলের তিনটি ইংরেজি প্রবন্ধ। এ-ছাড়া এ-বিষয়ে অন্যান্য গবেষকদের গবেষণা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

মাইকেল মধুসূদনের সনেট ও নাটক নিয়ে অনেক বেশি প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধ নিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে রচিত কোনো প্রবন্ধ বা গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন গবেষক তাঁদের গ্রন্থে ও প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিকভাবে মধুসূদনের ইংরেজি প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৯৯৩), ক্ষেত্রগুপ্ত (২০১২),

সুরেশচন্দ্র (১৯৯৭), শঙ্কর শীল (২০০৮), গোলাম মুর্শিদ (২০০৪) প্রমুখের সাহিত্যকর্ম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই প্রবন্ধ গবেষণার অন্যতম সীমাবদ্ধতা হলো, মধুসূদনের ইংরেজি প্রবন্ধের উপরে উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা, আলোচনা, পর্যালোচনা পাওয়া যায় না, খুব সীমিত কয়েকটি রচনার উপর নির্ভর করতে হয়।

বিশ্লেষণ

সামাজিক স্থবিরতা ও অনুন্নয়ন মধুসূদনের চিন্তা-ভাবনাকে দারুণভাবে আঘাত করে। সামাজিক অধঃগতির কারণ অনুসন্ধানপূর্বক প্রাথমিকভাবে তা থেকে উত্তরণের পথও তিনি দেখিয়েছেন। তিনটি ইংরেজি প্রবন্ধে আমরা সমাজচেতনার তাঁর স্বাক্ষর পাই। প্রবন্ধ তিনটি হলোঃ (১) 'On the importance of educating Hindu females' (১৮৪২), (২) 'Musalmans in India' (১৮৫৩) ও (৩) 'Remarriage of Hindu widows' (১৮৫৫)। এই তিনটি প্রবন্ধে মধুসূদন বাঙালি সমাজের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে পুরুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার পাশাপাশি নারীস্বাধীনতা, নারীঅধিকার, নারীশিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং হিন্দু-মুসলমান সহনশীলতার উপরও জোর তাগিদ দেন। সে যুগে ভারতীয় সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই চিন্তা-ভাবনা কেবল প্রগতিশীল নয় বরং বৈপ্লবিক বলা চলে। এই প্রবন্ধে মধুসূদনের সাহিত্যসাধনার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত তিনটি ইংরেজি প্রবন্ধের আলোকে তাঁর বাঙালি নারী ও সমাজোন্নয়ন ভাবনাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

উনিশ শতকে বাঙালি কবিদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ধারাবহির্ভূত এক প্রবল প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষাই তার মূল কারণ। ইংরেজের ঐহিক ঐশ্বর্যের বস্তুপ্রধান দিকটিকে, বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের শক্তিতে দীপ্ত ইংরেজের আবির্ভাবকে সেই যুগে বাঙালি শ্রেয় বলে মেনে নিয়েছিল–ইংরেজের মননশক্তির আলোকে বাঙালির মনোলোক উদ্ভাসিত হয়েছিল। আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের উদ্গাতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত অথচ ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর পারঙ্গমতা বিস্ময়ের বিষয়। তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনা বাংলায় নয়, ইংরেজিতে। মধুসূদনের জীবন, চরিত্র ও মানস-প্রতিভার স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হতে হলে তাঁর ইংরেজি রচনার সঙ্গে পরিচিতি আবশ্যক। মাত্র পনেরো-ষোল বছর বয়সে তিনি ইংরেজি কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ব্রিটিশ শাসনামলে যে প্রবল অভিঘাতে আন্দোলিত হয়েছিল বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনব্যবস্থায়, সাহিত্যে মধুসূদন দত্ত সেই অভূতপূর্ব উদ্দীপনাকে সঞ্চালিত করেছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি সাহিত্যের বিষয়বস্তু, ভাবাদর্শ ও প্রকাশশৈলীতে ইউরোপার্জিত নবীন চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটালেন। মধুসূদন দত্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যসাহিত্য পাঠের রুচি নিয়ে কাব্যসৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর রচনায় স্বদেশপ্রেম, স্বাধীন চিন্তা ও মানবিকবোধের লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। ভাব, ভাষা, প্রকরণশৈলী, জীবনাদর্শ ও বিষয়বিন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর সূচিত অভিনবত্ব বাঙালিচিত্তে এক নতুন চেতনার সঞ্চার করল। মানুষের হৃদয়াবেদনা ও জীবনবোধের মাত্রাকে একটা মর্যাদাময় স্তরে উন্নীত করে জীবনের বিপুল সম্ভাবনা ও অপার আগ্রহকে তিনি সাহিত্যে

প্রতিভাত করলেন। একই সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার দ্বান্দ্বিকতা, বিপন্ন প্রত্যাশা আর অন্তঃক্ষয়ে বিদীর্ণ হৃদয়কে মূর্ত করে তুললেন। তাঁর শিল্পভাষ্যের প্রতিপাদ্য শুধুই যন্ত্রণাবিদ্ধ চিত্তের হাহাকার নয়, আবেগী হৃদয়ের সুকোমল অনুভবে তাঁর সাহিত্য এক অনির্বচনীয় মাধুর্য ছড়ায়, অস্তিত্বময় মানুষের জাগরণী প্রেরণার উৎসস্থল হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর সমকালে অনেকের মধ্যেই নতুন প্রাণের প্রেরণা জেগেছিল। সমাজের শৃঙ্খলমোচনের অন্তর্তাগিদে উদ্দীপিত হৃদয়ের আবেগ বাঙালি মানসকে সেদিন সচকিত করে তুলেছিল। কিন্তু যুগার্থের সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার যে বিশুদ্ধ সমীকরণ মধুসূদন দত্তের জীবনে ঘটেছিল তা তুলনাহীন।

বাংলা ভাষায় সাহিত্যরচনার কোনো সম্ভাবনা বা মূল্য আছে–একথা সমকালীন ইংরেজি শিক্ষিত আরও পাঁচটি তরুণের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন না। হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন রিচার্ডসনকে। তাঁর কাছে ইংরেজি সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করতেন। রিচার্ডসন নিজে কবি ছিলেন। সে সময়কার ভারতীয় এবং ইংল্যান্ডের প্রধান প্রধান পত্রিকার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন এবং সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাছাড়া শেকস্পিয়র পড়াতেন চমৎকার। সে সময়কার উচ্চ শ্রেণির ছাত্রদের জন্য তিনি ব্রিটেনের কবিদের লেখা নিয়ে *Selections from the British Poets*নামক গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। তাঁর অধ্যাপনা-কৌশলও চমৎকার ছিল। যে গ্রন্থ তিনি অধ্যাপনা করতেন, তার দূরূহ অংশসমূহ এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে পড়াতেন যে ছাত্ররা মুগ্ধ হয়ে যেত।[১] বায়রন এসময়ে মধুসূদনের প্রিয় কবি হয়ে ওঠেন। ইংরেজি সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার কিশোর মধুসূদনের মনে সাহিত্যরুচির জন্ম দিয়েছিল। সমকালে বাংলা সাহিত্যের যে অবস্থা ছিল তাতে এই সাহিত্যরুচি তৃপ্ত হবার নয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) তখন বাঙালি কবিদের অগ্রগণ্য। শেকস্পিয়র-ওয়ার্ডসওয়ার্থ-বায়রন পড়া মধুসূদনের মনের কাছে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা কোনো আবেদনই নিয়ে এল না। গদ্যসাহিত্যেরও তখন তেমন পুষ্টি ঘটেনি। গদ্যশিল্পী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমার দত্তের প্রতিষ্ঠা আরও পরবর্তী ঘটনা। এই অর্বাচীন বাংলা ভাষায় স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ লেখা চলে, জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত হতে পারে পয়ার ছন্দে ক্ষুদ্র সরস কবিতা। ইংরেজি সাহিত্যের অমৃতস্বাদে যাদের অবারিত অধিকার, বাংলা সাহিত্যের এই অকিঞ্চিৎকর সঞ্চয় তাদের শুধু করুণাই জাগাতে পারে। মধুসূদন দত্ত বাংলায় কবিতা লেখার কথা ভাবতেই পারেন নি। এভাষায় কোনো উচ্চস্তরের কাব্য রচনা সম্ভব বলে তাঁর ধারণা ছিল না। এমনকি পরবর্তীকালে, বাংলা ভাষার উন্নততর অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *Rajmohon's Wife*নামে ইংরেজি ভাষায় উপন্যাস লিখে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চেয়েছিলেন।

মধুসূদন দত্ত হিন্দু কলেজের শিক্ষার গুণে এবং সমকালীন যুগ পরিবেশকে সহজে মেনে নেওয়ায় অতি তরুণ বয়স থেকেই আচার-আচরণে প্রায় সাহেব হয়ে ওঠেন। দেশি পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি তাঁর তীব্র অনীহা জন্মেছিল। এমনকি ইংরেজ-কন্যা ছাড়া অপর কাউকে বিয়ে করা অর্থহীন, এমন মন্তব্যও তিনি করেছেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এক প্রবন্ধে কৌতুক করে নব্যশিক্ষিতদের ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখার কথা বলেছিলেন। ইংল্যান্ডের তটভূমির জন্য মধুসূদনের তরুণ হৃদয় দীর্ঘশ্বাসে আলোড়িত হতো। তিনি কখন থেকে কবিতা লিখতে শুরু করেন, ঠিক জানা যায় না, তবে তাঁর সতেরো বছর বয়স হবার পূর্বে যে তিনি কবিতা লিখতে

শুরু করেন এটা নিশ্চিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৮৪১ সালে লেখা তাঁর বহু-উদ্ধৃত একটি কবিতার কথা এখানে বলা যায় :

> I sigh for Albion's distant shore,
> Its valleys green, its mountains high;
> Tho' friends, relations, I have none
> In that far clime, yet oh! I sigh
> To cross the vast Atlantic wave
> For glory, or a nameless grave![2]

১৮৪১ সালে অ্যালবিয়নের দেশকে তাঁর স্বদেশ বলেই বিবেচনা করেছেন : 'As if she is my native Land।' কিন্তু দু' বছরের মধ্যে 'King Porus' কবিতায় কবির এ বক্তব্য অনেকাংশে পাল্টে গেছে।[৩] 'King Porus' কবিতায় কবির যে স্বতঃস্ফূর্ততা ও আন্তরিকতা প্রকাশিত হয়েছে তা আমাদেরকে ডিরোজিওর 'Fakeer of Jungheera' কাব্যের উৎসর্গপত্রের স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতাটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মধুসূদন যখন ছাত্র তখন অবশ্য ডিরোজিও হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর প্রভাব প্রাগ্রসর শ্রেণির উপর থেকে তখনও মুছে যায় নি। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের শুধু ইংরেজি ভাষায় অধিকার লাভে সহায়তা করেন নি, যাতে তারা সত্যনিষ্ঠ, স্বদেশপ্রেমিক এবং চিন্তাশীল হয়ে স্বদেশের ও স্বজাতির কল্যাণসাধন করতে পারে, সেজন্য তিনি উপযুক্ত শিক্ষা দিতেন। হিন্দু কলেজে শুধু অধ্যয়নের মধ্যেই সাহিত্যচর্চা সীমাবদ্ধ ছিল না। ছাত্রদের মধ্যে যে সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, সেখানে স্বরচিত কবিতাপাঠ এবং আলোচনা চলত। ১৮৪১ সালের শেষের দিকে মধুসূদন হাতে লেখা একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি তিন-চার মাস চলেছিল, কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ডসনের প্রশংসা লাভ করেছিল। কবির প্রিয় শিক্ষক রিচার্ডসন এপত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা পড়ে দেখতেন এবং তাতে পত্রিকার প্রধান লেখক এবং সম্পাদক তরুণ মধুসূদন বিশেষ উৎসাহবোধ করতেন। রিচার্ডসন অনেক সময়ে মধুসূদনের কবিতা সংশোধন করে দিতেন এবং তাঁর ভাষা, ছন্দ ও কবিতার ভাব কী করে উন্নত করতে হবে সে সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। মধুসূদনের জীবনীকারেরা বলেছেন যে, তাঁর কবিতা *Calcutta Literary Gazette, Literary Gleaner, Bengal Herald, Oriental Magazine, Comet*ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হতো।[৪] রিচার্ডসন নিত্য উৎসাহ দিতেন। আর মুদ্রিত কবিতা নিয়ে বন্ধুজনের প্রশংসা কুড়াবার ও গর্ব করার নেশাও তরুণ কবির ছিল। ১৮৪২ সালের ৮ অক্টোবর মধুসূদন বিলেতের *ইষধপশড়িড়ফ গধমধুরহব*– এ প্রকাশের জন্য কয়েকটি কবিতা পাঠান। কয়েক বছর পূর্বে মধুসূদনের শিক্ষক রিচার্ডসনের কাব্যের প্রতিকূল সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকায়। কাজেই বোঝা যায়, এ পত্রিকার মান সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। ১৮৪২ সালে বিলেতের *Benteley's Miscellany, Blackwood's Magazine*, ও*Edinburgh Magazine*এ প্রকাশের জন্য তিনি কয়েকটি কবিতা পাঠান।

মধুসূদন দত্ত ইংল্যান্ড যেতে চেয়েছেন, কারণ ইংল্যান্ডে রোমান্টিক কবিদের নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বায়রন, শেলি, কীটস, মূর, সাউদি এবং হান্টের যোগাযোগের কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। মধুসূদনের শিক্ষক রিচার্ডসন ভালো কবিতা লিখতেন, অথচ

তিনি ভারতবর্ষে তেমন স্বীকৃতি পাননি, তাই স্বীকৃতিলাভের আশায় তিনি ইংল্যান্ডের কবিদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এই ঘটনা মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনে প্রভাব ফেলে থাকতে পারে। তিনি ভেবেছিলেন সত্যিকার কবিযশ পেতে হলে তাঁকে ইংল্যান্ড যেতে হবে। মধুসূদন দত্ত ১৮৪২ সালে লেখা একটি কবিতায় ইংল্যান্ড যাবার বাসনা ব্যক্ত করেছেন। ইংল্যান্ডে যাবার জন্য মধুসূদন যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি আলেকজান্ডার পোপের অনুরক্ত ছিলেন। সে কারণে বন্ধুরা তাঁকে পোপ বলে ডাকতেন। সেই আলেকজান্ডার পোপ লিখেছিলেন : "to follow Poetry, one must leave father and mother.।"[৫] বস্তুত, ১৮৪২ সালে তিনি ইংল্যান্ডে যাবার ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেছিলেন।

মধুসূদন দত্তের আবাল্য স্বপ্ন ছিল বিলেত যাবার, আর 'ইষঁব বুবফ মরৎষ'কে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করার। মধুসূদন তাঁর সাহিত্যসাধনার অভীপ্সা সম্পর্কে বন্ধু–বান্ধবদের পত্র মারফত অবগত করতেন। এই সকল পত্রপাঠে জানা যায়, তাঁর মধ্যে সুগভীর আত্মপ্রত্যয় ছিল যে, একদিন জগতের অন্যতম মহাকবিরূপে বিখ্যাত হবেন, যদি তিনি বিলেতে যেতে পারেন। বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখেছেন (নভেম্বর ২৫,১৮৪২) : "How should I like to see you write my Life if I happen to be a great poet– which I am almost sure I shall be, if I can go to England." তাই বন্ধুকে অনুরোধ করেছেন এই বলে যে, টমাস মূর যেমন বায়রনের জীবনী লিখেছেন গৌরদাসও যেন তাঁর জীবনী লেখেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন ও সাধের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় পিতার অভিলাষ : একটি দশমবর্ষীয়া বালিকাকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী মধুসূদনের এ বিয়েতে প্রবল আপত্তি। প্রথমত ছাত্রাবস্থায় বিবাহ, দ্বিতীয়ত, অশিক্ষিত নাবালিকা বিবাহ, তৃতীয়ত, অপরিচিত নারীকে বিবাহ। গভীর মনোবেদনায় এক রাতে গৌরদাসকে লিখেছেন (নভেম্বর ২৭, ১৮৪২) :

> You know my desire for leaving this country is too firmly rooted to be removed. The sun may forget to rise, but I cannot remove it from my heart. Depend upon it–in the course of a year or two more– I must either be in England or cease 'to be' at all; one of these must be done![৬]

মধুসূদনের এই মনোভাবের কথা তাঁর বন্ধু গৌরদাস জানতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "He longed for courtship though courtship was a myth in Hindu life।" মধুসূদনের পিতার নির্বাচিত পাত্রী সম্পর্কে গৌরদাস আরও বলেছেন: একেবারে পরীর মত দেখতে–"who was a cherub, a veritable peri."[৭] বড়ো হওয়ার জন্যে তিনি পরিবার, সমাজ ও ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন। বিলেত যাবার আশায় তিনি ধর্মান্তরিত হলেন। ধর্মান্তরিত হয়ে (১৮৪৩) তাঁকে পাদ্রিদের আশ্রয়ে থাকতে হয় এবং তিনি হিন্দু কলেজ ছেড়ে পাদ্রিদের বিশপ্স কলেজে ভর্তি হন। মধুসূদন ছিলেন নিভৃত স্বভাবের কিশোর। বই পড়া, কবিতা লেখা, পছন্দমত দু'চারজন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ, আর বিবেকের সংকেত-অনুযায়ী চলা– এই ছিল তাঁর জীবনবিধি। তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন: "মধু যখন কলেজে পড়িতেন, তখন অতি নিভৃতস্বভাব ছিলেন; দুই একটা বন্ধু ব্যতীত কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন

না। আমারও সঙ্গে বাক্যালাপ ছিল না। প্রতিভাসম্পন্ন লোকেরা এইরূপই হইয়া থাকে।"[৮] খ্রিষ্টান হলেও বন্ধুদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত পত্রালাপ করেছেন। মধুসূদন তাঁর কাঙ্ক্ষিত সমুদ্র পাড়ি দিলেন, তবে বিলেত নয় মাদ্রাজে – যে মাদ্রাজ ইংরেজদের একটি বড়ো ঘাঁটি। মাদ্রাজে অবস্থানকালে কবির ইংরেজি কাব্যসাধনা পূর্ণবেগে চলছিল। মাদ্রাজে তিনি *Madras Circulator and General Chronicle, Athenaeum, Spectator,Madras Hindu Chronicle*প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দুই সর্গের একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনি-কাব্য এবং একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাট্য মাদ্রাজে বসেই রচিত।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে সময়ে শিক্ষালাভ করেন, তখন ছাত্রদের মেধা ও মনন বিকাশের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্যোগে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। শিক্ষা সমিতির বার্ষিক বিবরণে ছাত্রদের রচিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও প্রশ্নোত্তরগুলো প্রকাশিত হতো।পুরস্কারবিতরণ অনুষ্ঠানে গভর্নর জেনারেল বা অন্য কোনো উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারি এবং দেশিয় ও ইউরোপীয় নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সামনেসেগুলো পাঠ করা হতো। ছাত্ররা তাঁদের প্রবন্ধের জন্য বৃত্তি এবং সোনা ও রূপার পদক পুরস্কার পেতেন। এরূপ উৎসাহদানের ফলে সে সময়ের অনেক ছাত্রই সুলেখক হতে পেরেছিলেন। "মধুসূদন যখন সিনিয়ার বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সেইসময় খ্যাতনামা বাবু রামগোপাল ঘোষ, স্ত্রী–শিক্ষা–বিষয়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য, দুইটী পদক দিতে প্রতিশ্রুত হন। হিন্দু কলেজের মধ্যে যে দুইজন ছাত্র প্রতিযোগিতায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবেন, তাঁহারা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন,এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। মধুসূদন এই প্রতিযোগিতায় প্রথম ও ভূদেববাবু দ্বিতীয় হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য, গুণানুসারে, স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিতপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"[৯] মধুসূদন দত্ত 'স্ত্রী-শিক্ষা' বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করে স্বর্ণপদক লাভ করার পর নিজের অভিব্যক্তি জানিয়ে ১৮৪৩ সালের ১৫ জানুয়ারি গৌরদাস বসাককে লিখেছিলেন : "I have got my medal sent me yesterday by Mr Kerr."[১০]

মধুসূদন দত্ত যে প্রবন্ধ রচনা করে স্বর্ণপদক লাভ করেন তার শিরোনাম ছিল : 'On the importance of educating Hindu Females.' এই বিষয় নিয়ে এর আগে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন। এরপর একই বিষয় নিয়ে তারপক্ষে লেখা সঙ্গত হবে কি না সে প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> Though it is almost hopeless for a school-boy to follow so great a master with anything like distinction (the very attempt to do so being a kind of literary sacrilege), yet as I am called upon to offer my unpremeditated thoughts on the subject, I cannot but hope that the indulgent reader will (to request him in the language of the Poet).[১১]

এক তরুণের এই উপলব্ধি দেশ-বিদেশের অনেক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সাহিত্যিকের পক্ষেও অনুধাবনযোগ্য। ছাত্রাবস্থায় তিনি কতটা সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে প্রবন্ধটিতে। প্রবন্ধটির একটি জায়গায় বলা হয়েছে :

> In a country like India, the importance of educating the females, (the sources from which man gathers the first rudiments of knowledge) is

> very great; for unless they are enlightened, they spread the infection of their ignorance in the minds of those they bring up.[১২]

তাঁর ইতিহাসজ্ঞান আমাদের অবাক করে। প্রাচীন ক্লাসিক্যাল অর্থাৎ গ্রিক ও রোমান সভ্যতা, ভারতীয় সভ্যতা, ইসলামি সভ্যতা থেকে শুরু করে তিনি সাম্প্রতিককালে এসে পৌঁছেছেন এবং ইতিহাসের দীর্ঘপথ বেয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন : "The trumpet-call of the Anglo-Saxon, is destined to rouse from his grave the Hindu, to a brighter, a fairer existence; the mystic wand of the Anglo-Saxon, is destined to break the dreamless slumber which now curtains him round."[১৩] পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে হিন্দু সমাজের বহু কুসংস্কার সম্পর্কে মধুসূদন সচেতন হয়েছিলেন। তৎকালীন হিন্দু সমাজে তখনো যুক্তির বাণী অনেকাংশে অর্থহীন, এও তিনি লক্ষ করেছিলেন। এ রকমের অনেক ঘটনা তিনি তাঁর উনিশ বছরের জীবনে দূর থেকে দেখেছিলেন, শুধু তাই নয়; মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যখন তাঁর বাবা-মা তাঁর মতের বিরুদ্ধে তাঁর বিয়ের আয়োজন করেন। তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কথা তারা ভেবে দেখেননি! একজন বিবেকবান এবং স্পর্শকাতর লোককে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করতে বাধ্য করলে সেটা যে তাঁর মনের উপর কী দারুণ প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে, তা তাঁরা উপলব্ধি করেননি। মধুসূদনের চিন্তার সঙ্গে তাঁর পরিবারের প্রাচীনপন্থী ধ্যানধারণার তুমুল পার্থক্য এখানে তীব্রভাবে প্রকটিত। এ প্রসঙ্গে তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাক লিখেছেন :

> অন্যের অনুরোধে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে বিসর্জন দেওয়া মধুর স্বভাব-বিরোধী, সে–ইচ্ছা গুরুজনদের হলেও। যার সঙ্গে বিবাহের পূর্বে তার মনের মিল হয়নি, তাকে কী করে সে গ্রহণ করবে; এটা তার চিন্তারও অতীত। কী করে ঐ পাত্রী গ্রহণ করবে, যার সঙ্গে মতের মিল হয়নি। মধু বিশ্বাস করত নারীপুরুষের মধ্যে সত্যকার প্রেম এর উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়। বিবাহ ব্যাপারে নিতান্ত জৈবিক অনুভূতি তার হৃদয়ে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। সে বিবাহ–পূর্ব প্রণয় চাইত, যদিও বিবাহ–পূর্ব প্রেম হিন্দু পরিবারে অলীক রূপকথা। শুধুমাত্র দৈহিক সৌন্দর্য দেখে তার মনে কোন আবেগ জন্মাত না; পারস্পরিক ভালবাসা, পারস্পরিক আবেগ ও অনুভূতির বিনিময় ব্যতীত প্রকৃত ভালবাসা জন্মাতে পারেনা বলে সে মনে করত। প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরা এ ব্যাপারে অন্যরকম আচরণ করতে পারেনা। শিশুমুখ দেখলে তার মনে ভালবাসার পরিবর্তে স্নেহ জন্মাত, ছোট বোনের প্রতি বড় ভাইয়ের মনে যে ভাব দেখা দেয়। সে আমাকে প্রায় বলত, সে বরং চিরকুমার হয়ে থেকে মরবে, তবু সে নিরক্ষর অশিক্ষিতা এবং সহানুভূতিশূন্যা কোন বালিকাকে বিয়ে করবে না। সে–যুগে আমাদের সমাজে এইরকম শিক্ষিতা মেয়ের সন্ধান পাওয়া ছিল অসম্ভব।[১৪]

তৎকালীন বাংলার ছেলেমেয়েরা বিয়ে করতো না, তাদের বিয়ে দেওয়া হতো। গুরুজনেরা বিয়ে জিনিসটাকে বলপূর্বক ছেলেমেয়েদের উপর চাপিয়ে দিতেন, স্বাভাবিকভাবেই ওসব বিয়েতে পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্যই ছিল না। বস্তুত সেকালে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ব্যক্তি–স্বাতন্ত্র্যবোধর উন্মেষ ঘটেনি। বিয়ের ব্যাপারটা ছিল কুলধর্ম রক্ষা করা। ব্যক্তির কোনো ভূমিকা সেখানে ছিল না। মধুসূদন ছিলেন ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক চেতনায় সমৃদ্ধ মানুষ। ব্যক্তি-স্বাধীনতার গুরুত্ব তাঁর কাছে অপরিসীম। তাঁর কাছে ব্যক্তিগত

স্বাতন্ত্র্যবোধ, নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য সবচেয়ে বেশি। তিনি মনে করেন, যে বিয়েতে নারী ও পুরুষের মতের কোনো মিল নেই, বস্তুত তাদের নিজস্ব মতামত বলেই কিছু নেই, যে বিয়ে তাদের উপর বলপূর্বক আরোপিত, সেই বিয়ে বংশরক্ষার নিমিত্ত জৈবিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ছাড়া আর কিছু নয়। আরও এক ধাপ এগিয়ে মধুসূদন বলেছেন, দৈহিক সৌন্দর্য ও জৈবিক অনুভূতির চেয়ে "পারস্পরিক ভালবাসা, পারস্পরিক আবেগ ও অনুভূতির বিনিময়, অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে।"[১৫] এজন্য তিনি চেয়েছিলেন বিবাহ-পূর্ব প্রণয়, তাঁর মতে একমাত্র সেখানেই পরস্পরের মতের মিল হওয়া সম্ভব। নরনারীর স্বাধীন অনুভূতি, স্বাধীন মতামত, ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা এসব মধুসূদনের কাছে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই চিন্তা শুধু প্রগতিশীল নয়, রীতিমতো বৈপ্লবিক।

গৌরদাস বসাকের বক্তব্য যে যথার্থ, সেটা প্রমাণিত হয় তৎকালে 'নারীদের অবস্থা' সম্পর্কে মধুসূদনের 'স্ত্রীশিক্ষা' বিষয়ক প্রবন্ধটি পাঠ করলে। প্রবন্ধটি রাজনারায়ণ তাঁর সঙ্গে জমিদার কন্যার বিয়ের উদ্যোগ নেবার কয়েক মাস পূর্বে রচিত। মধুসূদন লিখেছেন : "In India, I may say in all the Oriental countries, women are looked upon as created merely to contribute to the gratification of the animal appetites of men."[১৬] নারীরা পুরুষের ভোগ্যবস্তু, বিয়ে আসলে জান্তব প্রবৃত্তির উল্লাস– মধুসূদন চোখের সামনে এটাই দেখেছিলেন। পশ্চাৎপদ সমাজে নারীরা এভাবে মনুষ্যেত্বর জীবে পরিণত হয়েছে, এই নিদারুণ বাস্তব সত্য তাঁর চোখ এড়ায়নি : "It not only makes them appear as of inferior mental endowments, but no better than a sort of speaking brutes" এবং এর পরেই তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান : "The people of this country do not know the pleasure of domestic life. And indeed they cannot know, until civilization shows them the way to attain to it."[১৭]

মধুসূদন ইউরোপের সর্বাগ্রসর সভ্যতার কথা বলেছেন। যেখানে ব্যক্তির স্বাধীন মতামতের মর্যাদা আছে, ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য আছে, ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূল্য আছে। কিন্তু পশ্চাৎপদ বাংলায় সেই উন্নত সমাজের আশা যে সুদূরপরাহত একথা জেনেই তিনি লিখেছিলেন, নারীদের শিক্ষিত করা ছাড়া তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর অন্য কোনো পথ নেই। তাঁর ভাষায় :

> Extensive dissemination of knowledge amongst women is the surest way that leads a nation to civilizaiton and refinement, for it is women who first gives ideas to the future philosopher and would-be poet[১৮]

মধুসূদন শুধু নারীদের শিক্ষার কথাই বলেননি, সমাজব্যবস্থা কিভাবে সুন্দর হয়ে উঠতে পারে সে কথাও বলেছেন। তাঁর মতে, নারীরা শিক্ষার অভাবে শুধু মনুষ্যেতর জীবের পর্যায়ে অধঃপতিত হয়েছে তা-ই নয়, তাদের অজ্ঞতা প্রজন্মের পর প্রজন্মে সংক্রমিত হয়ে গোটা সমাজকে অসুস্থ করে তুলেছে। তাই নারীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোও সুস্থ সমাজ গঠনের প্রাথমিক শর্ত। এখানে দেশ ও কাল সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা প্রকাশিত হয়েছে।মধুসূদন দত্তের যুগে স্ত্রী–শিক্ষা বিস্তারে অনেকে উৎসাহী হয়েছিলেন। ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ব্যক্তি স্ত্রী–শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। এদেশে নারীর

পরাধীনতার বেদনা মধুসূদন দত্তের মনকে ক্লিষ্ট করেছিল। ১৮৬০ সালের ৮ আগস্ট কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত এক পত্রে তিনি মন্তব্য করেছেন : "The position of European females, both dramatically as well as socially, are very different."[১৯]

নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে মধুসূদন তাঁর যুগ ও সমাজের চেয়ে প্রাগ্রসর। সমকালের চেয়ে অনেক দূরবর্তী চিন্তাধারায় ঋদ্ধ তাঁর মনন। এই ব্যক্তি যে বিবাহ-পূর্ব প্রণয় চাইবেন, যাঁকে বিয়ে করবেন তার সঙ্গে রুচি কৃষ্টি-চিন্তার মিল হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করবেন, কোনো নিরক্ষর, অশিক্ষিত বালিকাকে বিয়ে করতে চাইবেন না এর মধ্যেআশ্চর্যের কিছু নেই। এই প্রবন্ধেই মধুসূদন স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন : "The happiness of a man who has an enlightened partner is quite complete."[২০]

১৮৫১ সালে লেখা মধুসূদন দত্তের দুটি প্রবন্ধ পাওয়া গেছে। প্রবন্ধদ্বয় বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, মধুসূদন দত্তের সমাজ-জিজ্ঞাসা কোন পথে মীমাংসা খুঁজেছে। ১৮৫১ সালে গজালু লক্ষ্মী নারসু চেট্টির *Crescent*পত্রিকায় প্রকাশিত বিবিধ বাগাড়ম্বরের প্রতিবাদে তিনি একটি প্রবন্ধে লেখেন :

> The *Crescent*, we perceive, has managed to delude the Friend of India, Father John, as they of Calcutta reverentially call him, into the belief of that the Dravida Hindus, that is to say, the people of this country, may allow their women to form matrimonial connections if deserted by their husbands; but they do not. Now, we beg leave to assure the Friend that the fundamental laws of Hinduism are the same wherever it is professed; and that the passage cited by the *Crescent* as permitting wives whose husbands degrade themselves by apostacy, to remarry is obsolete, and does not apply to this age- the Kali Yogum. We took the earliest opportunity to draw the attention of the *Crescent* to the ridiculous blunder and we have since heard that the twice-born editor of the *VurtamaneTarangini*, a Telegu Journal has been condemning the *Crescent* rather bitterly for his ignorance of the customs and manners of those whose cause he has undertaken to advocate- for a consideration of course. We entreat the Friend never to attach much weight to what the *Crescent* says about such matters. Our local contemporary amusing enough when club in hand, he talks for like a superannuated Hercules, to demolish the poor missionaries and their converts, but as for being instructive he is seldom guilty of that.[২১]

মধুসূদন দত্তের দ্বিতীয় প্রবন্ধটিও হিন্দু নারীর দুরবস্থা এবং তার সম্পত্তি অধিকারের উপর রচিত। এতে তিনি বলেছেন: "Those who impunge Justice Burton's judgment have yet to show that the shastras as well as the manners and customs of the Hindu unanimously recognize the existence of separate rights as regards a Hindu wife, the solitary verse quoted from Manu by the

Crescent won't do"[২২] প্রবন্ধটিতেস্বামীর প্রতি নারীর আনুগত্যের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। বিধবাবিবাহ এবং স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার– এ দুটি বিষয়ে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। ১৮৫৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর *Madras Spectator*পত্রিকায় তাঁর'Remarriage of Hindu Widows'প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

মধুসূদন দত্ত অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। কোনো ধর্মের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা ছিলনা। মানুষের ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে তার মানবিক পরিচয় মধুসূদনের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ছাত্রাবস্থায় তাঁর মধ্যে এ মানবিকচেতনার উন্মেষ ঘটে। তাই কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি "to give education to all classes, sects, and creeds"– কে সমর্থন করেন। এর অন্যথা হলে তাকে "hot-bed of casteism" বলেন। এ ঘটনায় তাঁর আধুনিক চিন্তা-চেতনা ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।[২৩] তিনি মাদ্রাজে অবস্থানকালে ১৮৫৩ সালের ২ আগস্ট মুসলমানদের পক্ষেও প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির নাম 'Mussalmans in India,' প্রবন্ধটিতে বলা হয় :

> Allison has written nothing to excel the foregoing passage and the history of Akbar like the history of great Sovereigns, represents him as endowed with lofty virtues and, but disgraced by enormous vices. Such was the character of Alexander, of Hannibal, of Caeser among the ancients,– such that of Constantine the Great, of Frederick the Great, of Napoleon the Great-among the moderns. Soloman, the wisest man was a disgrace to humanity. Was George the fourth any better? Turn to the history of England, was there a monarch more infamous than the Eighth Henry or more bloody than his daughter, Mary? India under the Moslem rule was more prosperous than the Leadenhall rule. Sir Charles may disguise the fact, but history is against him. Again, back to a period anterior to the incurious of the followers of the Prophet of Mecca, what do we read? Of the governing powers of India before the Mussalman incurious and conquests, we know little indeed, but from the genius and disposition of the people, we are led to conclude that their sway was sufficiently mild and tolerable and perhaps the best suited to the time, and condition of the people and country. There can be no doubt of this, and has such a thing as railways been known in those days, the whole country would have been intersected by them, for, see the stupendous temples and magnificent artificial lakes bequeathed to posterity by the ancient sovereigns of India![২৪]

এ প্রবন্ধটি লেখার কিছুদিন পূর্বে মধুসূদন দত্ত মাদ্রাজে একটি ইংরেজি কাব্যনাট্য লিখেছিলেন : 'Rizia–the Empress of Inde'। মাদ্রাজের *Eurasian*পত্রিকায় ১৮৪৯-১৮৫০ সালে এটি ক্রমান্বয়ে সাতটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।নাটকে রিজিয়া ভারতসম্রাজ্ঞীবলে গর্ববোধ করেছেন। এ নাটকে তিনি মুসলমানদের শৌর্যবীর্য এবং বীরত্বের কথা তুলে ধরেছিলেন। মাদ্রাজে রচিত *CaptiveLadie*কাব্যটি ১৮৪৮ সালে *The Madras*

*Circulator and General Chronicle*নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। দুই সর্গে বিভক্ত কাব্যটি কিংবদন্তি ও ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত।এ কাব্যে খুঁজে পাওয়া যায় নারীর স্বাধীন প্রেমের অনুভূতি। যেমন :

> None softer in its store – of brighter sheen –
> Than Love – than gentle Love : and thou to me
> Art that sweet dream, mine own !in glad reality ![২৫]

"Rizia – the Empress of Inde" নাটকেও নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন মধুসূদন দত্তঃ "She had the manliest heart – Tho' a woman।"[২৬] সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীকে পুরুষের ভোগ্যপণ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। কিন্তু মধুসূদন দত্ত নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। মাদ্রাজে অবস্থানকালেও সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেছেন তিনি, নারীদের আত্মচেতনার প্রশ্নটিকে তুলে ধরেছেন।

মধুসূদন দত্ত কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনাবলি নিয়ে মহাকাব্য রচনার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করেছেন। মুসলমানদের বিষয় নিয়ে নাটক লিখতে চেয়েছেন। *Hindu Chronicle*পত্রিকায় 'Mussalmans in India' প্রবন্ধে মুসলমান শাসনামলের সমালোচনার পাশাপাশি লীডেন হলের শাসনে ভারতের দুরবস্থারকথা বললেন। হিন্দুসমাজে বিচরণ করে মুসলমান শাসনামলের প্রশংসা করলেন। ফলে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এবং হিন্দুসমাজ উভয়েইমধুসূদন দত্তের উপর ক্ষুব্ধ হলেন। এ প্রসঙ্গে *Athenaeum*পত্রিকায় লেখা হলো, "যে মুখে প্রবন্ধকার মুসলমান শাসনের প্রশংসা করছেন, আবার সেই মুখে কর্ণাটের নবাবের রাজ্য অপহরণের সমর্থন জানাচ্ছেন কি করে?"[২৭] তারা মধুসূদন দত্তের বক্তব্যে স্ববিরোধিতার সন্ধান পেলেন। সত্যিই কি কোনো স্ববিরোধিতা আছে? মুসলমান শাসন তো বিদেশি শাসন নয়, সুলতান মাহমুদের যুগ বহু পূর্বেই শেষ হয়েছে। আর নাদির শাহ বা আহমদ শাহ আবদালীর সঙ্গে মুসলমানরাও কি লড়াই করেননি? তাইমধুসূদন দত্ত ক্ষয়িষ্ণু মুসলমান সামন্ত নৃপতির বিলাস ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে সমর্থন জানাতে পারেননা। মধুসূদন দত্তের 'Mussalmans in India' প্রবন্ধটির পক্ষে-বিপক্ষে নানা তর্ক-বিতর্ক ও সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৫১ সালে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পুনর্মুদ্রণসহ উদ্ধৃত হতে থাকে এবং আলোচনা-সমালোচনা অব্যাহত ছিল।

মধুসূদন দত্তের অন্যান্য প্রবন্ধেও মুক্তবুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি চেয়েছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতা। সঙ্কীর্ণতা আধুনিকতার পরিপন্থি, ফরাসি বিপ্লব শুধু ফ্রান্সের জন্য নয়, সারা বিশ্বে মানবতার বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিল। মাদ্রাজেও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছিল। ১৮৫৫ সালের ১৭ আগস্ট মাদ্রাজেউচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে। উডের সুসমাচার (Wood's Despatch, 1854) অনুযায়ী 'ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' গঠিত হলো। কিন্তু মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি হয়। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্রের ৫ নং ধারায় ছিল : "members of all creeds and sects shall be admissible, consistently with which primary object, care shall be taken to avoid whatever may tend to violate or offend the religious feelings of any class."[২৮]

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক শিক্ষার প্রচলন হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি অনুদান ছিল, তাই স্থানীয় বিশপরা এখানে বাইবেল পাঠ প্রবর্তনের জন্যে দাবি জানান। কিন্তু মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সদস্য জর্জ নর্টন এর বিরোধিতা করেন। পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য মিঃ জন ব্রুস নর্টন, জর্জ নর্টনকে সমর্থন করে বলেন:

> here in Madras, the influence of a certain section of society has hitherto thwarted the spread of education as a Government measure, because, according to their views, a system not avowedly based upon the Bible instruction is worse than none at all; and the only Government institution, because it is established for purely secular education, has been branded as the Godless University.[২৯]

মধুসূদন দত্ত খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও জোরপূর্বক দলিত ও সাধারণ শ্রেণির লোকদের খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করায় যাজকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ১৮৫১ সালের ২০ মার্চ *Hindu Chronicle*পত্রিকায় বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন : "এমন কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি যিনি সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষালয়ে পড়াশুনা করেছেন, যেখানে বাইবেল না পড়েই তিনি খ্রিষ্টান হয়েছেন।" 'Native Education' প্রবন্ধে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর এ ধরনের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছেন বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে, বাইবেল পড়ানো জোর জবরদস্তি করা ছাড়া কিছুই নয়–এমন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাইবেল পড়লেই খ্রিষ্টধর্মের প্রসার ঘটবে এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই। আমরা জানি, মধুসূদন দত্ত ইংরেজদের পরিচালিত হিন্দু কলেজে পড়াশোনা করেছেন। সেখানে কঠোরভাবে বাইবেল পাঠ নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি বাইবেল বহন করাও ছিল ছাত্রদের পক্ষে দণ্ডনীয় অপরাধ। যে অপূর্ব ধর্ম পৃথিবীর এক বৃহৎ অংশের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনেছে, আজকের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতির বিজ্ঞতম ও মহত্তম ব্যক্তিরা যে ধর্মকে পূজা করেন, যে ধর্ম নিউটন, বেকন ও বাটলারের ধর্ম, মধুসূদন দত্তের বিশ্বাস সেই ধর্মকে এতো অকিঞ্চিৎকর মনে করা বোকামি। মধুসূদন দত্ত লিখলেন : "গভর্নরের শাসন পরিষদের জনৈক সদস্য বাইবেল অন্তর্ভুক্তির জন্য ব্যগ্রতা দেখাচ্ছেন; তিনি যা করছেন তা তাঁর আদৌ করা অনুচিত। যদি তিনি এদেশের লোকের স্বার্থের প্রতি বিন্দুমাত্র নজর দিতেন। তাঁর উদ্দেশ্যকে স্মরণ করা যেতে পারে, কিন্তু তিনি যে ঠিক কাজ করছেন, একথা মনে করা যায় না। মধুসূদন দত্ত স্পষ্ট বললেন : "যে ব্যক্তি এদেশের শিক্ষাপ্রসার সুনজরে দেখেন না, "We wish him a pleasant morning."[৩০] সাম্প্রদায়িক চেতনাকে কখনো তিনি প্রশ্রয় দেননি। শাসকরা বাইবেল শিক্ষাকে আবশ্যিক করবেন, অথচ দেশীয়দের শিক্ষিত করে তোলার বিরোধিতা করবেন, এটা মধুসূদন দত্তের মতো স্বাদেশিক চিন্তার ব্যক্তির পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে নেটিভদের শিক্ষা–সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার যে অপচেষ্টা, তার বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করলেন তিনি। দেশীয়দের উন্নত শিক্ষার কথা বললেন, হিন্দুদের হিন্দুত্ব নিয়ে না ভেবে তাঁদেরকে আরো সজাগ হবার পরামর্শ দিলেন। মাদ্রাজে অবস্থানকালে মধুসূদন দত্ত হিন্দু উগ্রপন্থিদের বিরুদ্ধে লিখে স্থানীয় ব্রাহ্মণদের বিরাগভাজন হন। ১৮৫৩ সালের ২৮ আগস্ট মধুসূদন দত্ত উগ্রপন্থি খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধাচরণ করেন। *Circulator* পত্রিকা এ বিষয়ে তাঁর বিরোধিত করে। মধুসূদন দত্ত স্বধর্ম ত্যাগ করেছিলেন; কিন্তু, স্বজাতিদ্বেষী বা স্বধর্মদ্বেষী

ছিলেননা। তিনি স্পষ্ট জানালেন : “আমরা যে সমাজে জন্মেছি তার নৈতিক দৃষ্টিকোণ (moral point of view) খ্রিষ্টসমাজ থেকে হীনতর ছিল, একথা মানিনা।তবে হিন্দুসমাজের প্রভূত উন্নতিসাধনের অবকাশ রয়েছে। হিন্দু সমাজের দুরবস্থা সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন, কিন্তু হতাশ ছিলেননা। “The Hindu mind though crushed by a false faith and a cruel system of moral tyranny is still has a lamp dim but within it.” অবশ্য মধুসূদন দত্তের এ অভিমত অধিকাংশ খ্রিষ্টানি পত্রিকায় প্রকাশিত ও সমালোচিত হয়েছিল। ১৮৫১ সালের ১০ মে *Eastern Guardian*লিখেছিল :

> By what process of understanding the Editor of *Hindu Chronicle* ever became a convert to the Christian religion, it will not be easy for us to say if this most obvious evidence of the superiority of the Christian religion over the Hindu creed of reforming the morale of a community stamping society with at least an outward respect for Good and Virtue be excluded from all sphere in his conversion.[৩১]

ধর্ম ও জাতিত্ব এক নয়। স্বধর্মত্যাগী মধুসূদন দত্ত হিন্দুজাতির মহিমায় গর্ববোধ করেন, *মেঘনাদবধ* কাব্যে স্বজাতিদ্রোহী বিভীষণকে ভর্ৎসনার মধ্যে তাঁর স্বজাতিপ্রীতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

উনিশ শতকে পৃথিবীব্যাপী আনুষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। শেলী তাঁর *QueenMab*কাব্যে খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন। ফরাসি বিপ্লব ও ফরাসি দর্শন ধর্মকে আচার-অনুষ্ঠান, গির্জা, মন্দির ও যাজক- পুরোহিতের নাগালের বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। বাংলাদেশ এবং মাদ্রাজেও প্রগতির ছোঁয়া লেগেছিল। রাজা রামমোহন রায়ের আন্দোলন সেই আন্তর্জাতিক আন্দোলনের অংশ।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রবন্ধগুলো বাঙালি সমাজকে দিকনির্দেশনা দিতে সমর্থ হয়েছিল। *Madras Hindu Chronicle* পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, নিবন্ধ ও প্রবন্ধসমূহের মধ্যে দিয়ে মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, উদার, মুক্তচিন্তার অধিকারী মধুসূদন দত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর প্রবন্ধে নারীর দুরবস্থা, সম্পত্তি অধিকারের আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে ধরেন।স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার, বিধবা বিবাহের পক্ষে তিনি কথা বলেন।সাহিত্যের পাশাপাশি বাস্তবেও নারীর স্বাধিকার রক্ষায় তিনি সোচ্চার ছিলেন। তিনি মনুসংহিতার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন :“প্রাচীন ভারতে হিন্দু সমাজে নারীদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার ছিল।”[৩২] তিনি সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শৃঙ্খল থেকে নারীদের উদ্ধারের জন্য সোচ্চার হয়েছেন। নারী সম্পর্কিত তাঁর এই প্রগতিশীল চিন্তা অবশ্যই ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবার ফল, রেনেসাঁসের চিন্তার প্রতিধ্বনি।মধুসূদন দত্ত ছিলেন নবীনতার উপাসক, আধুনিক চিন্তা-চেতনায় আস্থাশীল। মাদ্রাজে অবস্থানকালে রক্ষণশীলদের বিপক্ষে তিনি লেখনি ধারণ করেন। একই সময়ে কলকাতার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তিনি দৃষ্টি রাখতেন। তিনি মাদ্রাজের পত্রিকায় কলকাতার ঘটনাবলির উপর নিবন্ধ প্রকাশ করতেন। প্রসঙ্গ বিশেষে সমর্থন জানাতেন, প্রতিবাদও করতেন। হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি পূণ সমর্থন করেননি।

তাঁর মনে হয়েছিল এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার পেছনে হিন্দুসমাজের জাত্যভিমান প্রবলভাবে কাজ করেছে। *Spectator*পত্রিকায় তিনি লেখেন :

> It is not the Metropolitan College, the institution which the old Bengal founded, because it could not appreciate the spirit of liberality that led the Government to throw open the Presidency College to all classes of the community. Is it not the hot-bed of casteism?[৩৩]

মধুসূদন দত্ত লিখলেন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য আইন প্রণয়ন করা কষ্টসাধ্য, বিশেষ করে যদি সেক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথা প্রকট থাকে। সালোন বা ড্রাকোর মতো আইন প্রণয়নকারীরাও এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে যান। তিনি প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, ভারতবর্ষ প্রতিদিন গতিশীলতা অর্জন করছে। যুগধর্ম অনুযায়ী তাকেও আইন প্রণয়ন করতে হবে। পণ্ডিত ও মৌলবীদের মনঃপ্রাণ ধর্মগ্রন্থে আবদ্ধ। তাঁদের মতবাদ ও ধর্মীয় গোড়ামি অগ্রাহ্য করে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করতে হবে। তবে ভারতের রাজনৈতিক রক্ষণশীলতার সঙ্গে যতদূর সম্ভব সংঘাত এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন তিনি। তিনি বলেন : "Bacon-fed and be-Shakespeared men can have but little reverence for Manu and the gymo-Sophists of old."[৩৪]

মধুসূদন দত্ত বিধবার পুনর্বিবাহ সমর্থন করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেননি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের সমর্থনে লেখা গ্রন্থ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হলে মাদ্রাজসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মাদ্রাজপ্রবাসীমধুসূদন এ আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, তাতে তিনি অন্য প্রদেশের প্রতিক্রিয়ার কথাও উত্থাপন করেন। তিনি বলেন: "আমরা এতদিন জানিতাম যে, পুণার ব্রাহ্মণরা পর্যন্ত এই আইনের পক্ষে আইন পরিষদে স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন? কলকাতার রক্ষণশীল সমাজ এই আইন বরবাদ করার জন্য ৫০ হাজার টাকা চাঁদা তুলেছে, তাঁদের প্রয়াস সফল হবেনা।"[৩৫]মধুসূদন মাদ্রাজের অবস্থা ভালোভাবে জানতেন। তাই মাদ্রাজের প্রসঙ্গ টেনেই প্রবন্ধ শেষ করেছেন :

> Madras has often been reported as the Headquarter of Native Intolerance, but we trust that the conduct of her educated Hindu will in this instance prove that the taunt has ceased to apply.[৩৬]

১৮৫১ সালে রচিত একটি প্রবন্ধেমধুসূদন দত্ত পুরুষের বহুবিবাহের তীব্র বিরোধিতা করেন। মাদ্রাজে তখনো হিন্দু সমাজে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মধুসূদন দত্ত বহুবিবাহের বিপক্ষে প্রবন্ধ লিখলেন। ১৮৫২ সালে ২ জানুয়ারি মাদ্রাজের *Madras Examiner* পত্রিকায় তাঁর এই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়। তিনি হিন্দুদের অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান করে বলেছেন : "শুধু বহুবিবাহ নয়, বিবাহের ব্যাপারে পিতার প্রতি অতি-প্রভুত্ব হিন্দু সমাজকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে।" 'On the importance of educating Hindu Females' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, এদেশের লোকেরা দাম্পত্য জীবনের মধুরতা কাকে বলে জানেনা, আবার তিনিই লিখলেন, হিন্দু সমাজের অধঃপতনের অন্যতম কারণ পুরুষের বহুবিবাহ। শুধু বহুবিবাহ নয়, বিবাহের ব্যাপারে পিতার অতি-প্রভুত্ব হিন্দু সমাজকে

ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে। এই বক্তব্যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছিল বলে মনে হলেও সামগ্রিক অর্থে তাঁর চিন্তা ছিল যুগের চেয়ে অগ্রসর, কুসংস্কারমুক্ত, প্রগতিশীল।

হিন্দুসমাজকে কুসংস্কার, নীতিহীনতা ও স্বেচ্ছাচারের উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেও মধুসূদন দত্ত জানালেন যে, এখনও এ সমাজের উন্নতিসাধনের সম্ভাবনা আছে। তাঁর মতে, সেই সম্ভাবনা বাস্তবায়নের একটি দিক হলো সামন্ততন্ত্রের অন্ধকার থেকে নারী-পুরুষকে উদ্ধার করে তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় নিয়ে আসা, স্বাধীন অনুভূতি ও চিন্তা প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া,আধুনিক ও মুক্তমনের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।

উপসংহার

পরিশেষে, সমাজ তথা দেশের উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বর্তমানে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়। নারীর অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অনেক দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। তবে এ-অবস্থা হঠাৎ আসেনি। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর উন্নয়নে মাইকেল মধুসূদন, বেগম রোকেয়া, রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল, লালন প্রমুখের অসামান্য অবদানের ফলে ধীরে ধীরে নারীর ক্রমোন্নয়ন ঘটেছে। সুতরাং বাঙালিসমাজে সমাজউন্নয়নে নারীর উন্নয়ন নিয়ে চিন্তকদের মধ্যে মধুসূদন অবশ্যই অগ্রগণ্য। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে মধুসূদনের মনে এই প্রতীতিজন্মায় যে, মানুষের অন্তর্লোকের পুনর্জাগরণ ব্যতিরেকে মানবতাবোধের জয়গান, মানবমুক্তির ব্যঞ্জনা সাহিত্য, ব্যক্তিগত জীবনচর্চা, শিক্ষাদর্শন কোনো ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই তাঁর মানসলোকে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, সেই মানবদর্শন তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলন ঘটান। এক্ষেত্রে সমসাময়িক বাংলাসাহিত্যের রচনায় বিদ্যমান শৈলীগত ও বিষয়ভাবগত আড়ষ্টতা মধুসূদন অসাধারণ প্রতিভা ও দক্ষতা গুণে দূরীভূত করেন। এক্ষেত্রে কবিতা ও নাটকের মতো প্রবন্ধ সাহিত্যেও রেখেছেন স্বতন্ত্র্যতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। আলোচিত তিনটি ইংরেজি প্রবন্ধে বাঙালি নারী ও সমাজের উন্নয়নে তাঁর চিন্তাভাবনা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভুবনে মধ্যাহ্ন সূর্য হয়ে আলোকরশ্মি ছড়িয়ে আলোকিত করেছে সমগ্র সাহিত্যভুবন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. যোগীন্দ্রনাথ বসু, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, পৃ. ৫৮

২. ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পাদিত), *মধুসূদন রচনাবলী*, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ২০১২, পৃ. ৪১৮

৩. গোলাম মুরশিদ, *আশার ছলনে ভুলি*, কলকাতা, আনন্দ, ২০১১, পৃ. ৪৭

৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১

৬. Ghulam Murshid, *The Heart of a Rebel Poet: Letters of Michael Madhusudan Dutt,* New Delhi, Oxford University Press, ২০০৪, পৃ. ৩৩

৭. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবন ও সাহিত্য*, কলকাতা, পুথিপত্র, ১৯৯৭, পৃ .৫০

৮. যোগীন্দ্রনাথ বসু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭০

৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

১০. Ghulam Murshid, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

১১. ক্ষেত্রগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯৪

১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯৫

১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০৫

১৪. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

১৫. শঙ্কর শীল, *মধুসূদনের সমাজচেতনা*, কলকাতা, প্রতিভাস,২০০৮, পৃ. ২০

১৬. ক্ষেত্রগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯৫

১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯৫

১৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯৫

১৯. Ghulam Murshid, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯

২০. ক্ষেত্রগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯৫

২১. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯

২২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯

২৩. শঙ্কর শীল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

২৪. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬

২৫. ক্ষেত্রগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬০

২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৮

২৭. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০, ১০১

২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২

২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২

৩০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১, ১০২

৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬

৩২. শঙ্কর শীল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

৩৩. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮

৩৪. *প্রাগুক্ত*

৩৫. *প্রাগুক্ত*

৩৬. *প্রাগুক্ত*